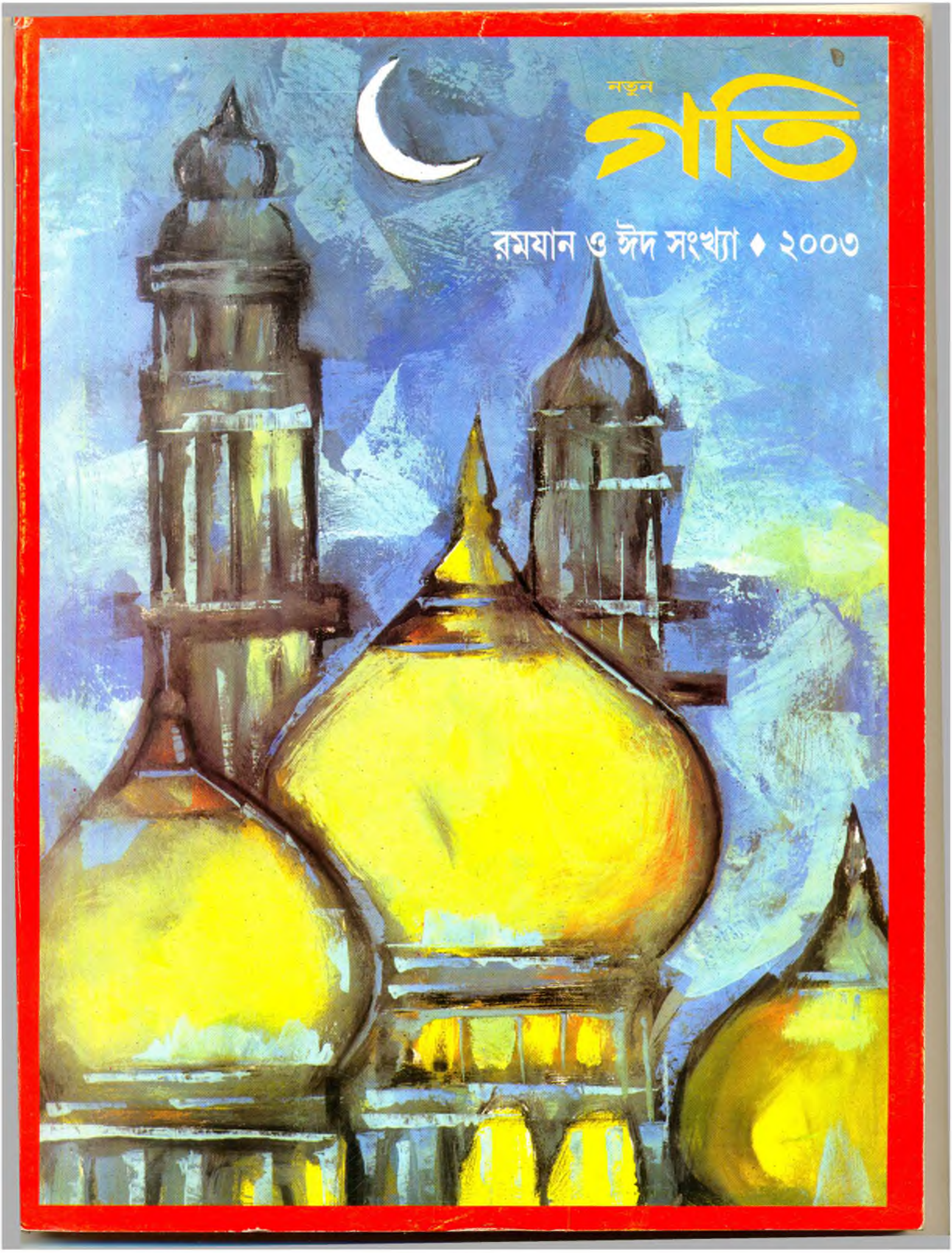
নতুন
গতি
রমযান ও ঈদ সংখ্যা ♦ ২০০৩

শিক্ষাদরদী ও দানবীর
চট্টার খান সাহেব সুবিদ আলি মোল্লা

সারফুদ্দিন মল্লিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মহেশতলার চট্টাকালিকাপুর গ্রামের এক সাধারণ দর্জি পরিবারে খান সাহেব সুবিদ আলি মোল্লা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন হায়দর আলি মোল্লা। হায়দর সাহেবের দুই পুত্র এজাহার আলি মোল্লা ও ইসহাক আলি মোল্লা। সামান্য মাটির ঘরে ছিল তাঁদের আস্তানা। দর্জি কাজের সামান্য উপায় ছিল জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন।

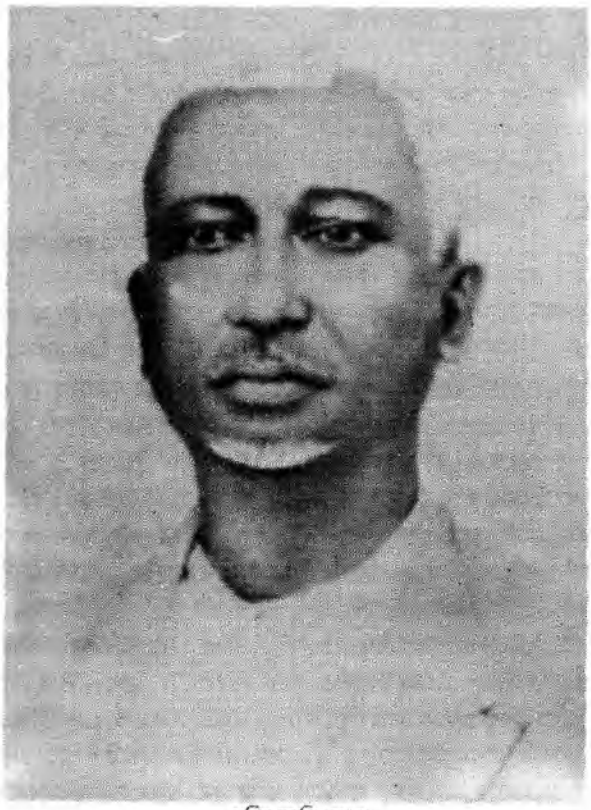

সুবিদ আলি মোল্লা

এজাহার আলি মোল্লার চার পুত্র। সবার বড় সুবিদ আলি মোল্লা, অন্যরা হলেন ইমাম বক্স, একিন বক্স ও ইরান আলি আর একমাত্র কন্যা খাদিজা বিবি। ইরান আলি যুবক বয়সে মারা যান। তখন চট্টা এলাকায় বেশির ভাগ দুই শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধের পোষাক তৈরী করতেন। আর তৈরি হতো দশ পঁচিশ খেলার 'চৌপাট'। মোল্লা পরিবারের লোকজন এই কাজে যুক্ত ছিলেন। চট্টা চালকিপাড়া অঞ্চলে তখন বিখ্যাত কাপড়ের ব্যবসায়ী ও দর্জি শিল্পের বেশ নামডাক ছিল। রহমান মণ্ডল এদের মধ্যে একজন। রহমান মণ্ডলের দোকানে কাজের সুবাদে সুবিদ আলি তাঁর সংস্পর্শে আসেন। যুবক সুবিদকে এক পলক দেখেই রহমান সাহেবের ভালো লেগে যায়। সুন্দর সুঠাম চেহারা, মুখ মণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য যেন সূর্য কিরণের প্রতীক। কথা বার্তায় ছিল অনিন্দ্য সুন্দর কোমলীয় মাধুর্য্য। শৈশব হতেই সব কাজে তাঁর ছিল সাহস সততা দৃঢ়তা আর ব্যবসায়িক মন। একঘেয়েমি কাপড়ের ব্যবসার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্য ছিল তার অন্তরে -- ফলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে সফল ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। চালকিপাড়ার রহমান মণ্ডলের তীক্ষ্ণ চোখ চিনে ফেলে সুবিদ আলিকে। ভাবেন এ সুবিদ অনেক দূর এগোবে। সুবিদকে নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। তাঁর অন্তরচক্ষু বলে সুবিদকে জামাই করলে ভালোই হবে। মানসিকভাবে দারুণ সাড়া পান। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এবং একদিন সুবিদ আলী সাহেবের পিতা এজাহার আলী সাহেবের কাছে যান এবং তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। বলেন আমার কন্যা আসিয়া বিবাহ যোগ্যা হয়ে উঠেছে। সুবিদের সাথে আমি তাঁর বিয়ে দিতে চাই। সুবিদের পিতা এজাহার সাহেব এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। এক আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবিদ আলির সঙ্গে আসিয়ার বিয়ে হয়। আসিয়া বিবি পিতার পাকা বাড়ি ছেড়ে স্বামীর সাধারন বাড়িতে প্রবেশ করেন। সুবিদ আলি সাহেবের যোগ্য সহধর্মিনী হিসাবে আসিয়া বিবি সংসারের সকলকে আপন করে নিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরেন সংসার তরীর।

সুবিদ সাহেব ও দুই ভাই একিন বক্স আর ইমাম বক্সের যোগ্য সহায়তায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় ব্যবসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। প্রথমে সাধারণ দর্জি, পরে ওস্তাগর (যাঁরা অনেক দর্জি খাটায় তাঁদের ওস্তাগর বলা হয়) হন এবং হাওড়া হাটে ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায় আরও উন্নতি হলে তিনি মধ্য কলকাতার চাঁদনি এলাকায় দোকান নিয়ে স্থায়ীভাবে বড় ব্যবসা শুরু করেন। সারা ভারতে তাঁর ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। ভারত জুড়ে তিনি বড় ওস্তাগর হিসাবে খ্যাত হয়ে ওঠেন।

তখন রাস্তাঘাট পরিবহন ব্যবস্থা এমন উন্নত ধরনের ছিলনা। ফলে অতি কষ্টে মাটির কাঁচা কাদামাখা রাস্তায় মাথামুটে বা গরুর গাড়ি করে আকড়া স্টেশনে পৌঁছতেন তৈরি করা জামাকাপড় নিয়ে। বর্ষাকালে গরুর গাড়িও চলত না। পায়ে হেঁটেও দীর্ঘপথ যাওয়া যেত না। ডোঙার মত এক ধরণের লম্বা জলযান -- যার নাম 'সালতি' - এই সালতিতে করে আনা নেওয়া করতে হত মালপত্র। বর্ষার তিন চার মাস চট্টার সাথে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্গম। সুবিদ আলী এসব কোন বাধাকেই বাধা মনে করেননি। শ্রমে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। দুর্গমকে জয় করাই ছিল তাঁর ব্রত। একবার প্রচুর মাল নিয়ে সালতিতে করে আনা নেওয়া করতে গিয়ে সালতিটা উল্টে যায়। ফলে সব মাল ডুবে যায়। সুবিদ আলির পুত্র নজিবর রহমান বলেন পিতা ভাইদের নিয়ে বহুকষ্টে জলের তলা থেকে সেই সব মাল তুলে আনেন ধীরে ধীরে। হাওড়া মঙ্গলা হাটে প্রতি মঙ্গলবার এশিয়ার বৃহত্তর হাট বসতো। তখন এতবড় হাট অন্য কোথাও ছিলনা। হাওড়া

কোর্ট চত্বরের ময়দানে গরু, ঘোড়ার খেলা দেখানোর একটা প্রচলন ছিল পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। সুবিদ সাহেব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন এত অসুবিধার মধ্য দিয়ে ব্যবসা করা সমস্যার ব্যাপার। তাছাড়া সারা ভারতের খরিদ্দারদের থাকা খাওয়ারও অসুবিধা ছিল। সেজন্য তিনি কলকাতার ম্যাডান স্ট্রীটে জমি সংগ্রহ করে ১৯২৯ সালে ছ'তলা বিরাট বাড়ি তৈরি করেন, যা সুবিদ বিল্ডিং হিসাবে আজও খ্যাত। এই বাড়ি থেকেই সুবিদ সাহেব ব্যবসার কলেবর বহুগুণে বাড়িয়ে তোলেন। ম্যাডান স্ট্রিট ৪ এ ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় বিল্ডিং ও ম্যাডান স্ট্রীট ৩ এ তে ১৯৩৯ সালে তৃতীয় বিরাট বিল্ডিং তৈরি করেন। এই সময় সুবিদ সাহেব চট্টা গ্রামে নিজ জন্মভূমিতেও বিরাট জমিদারি বাড়ি তৈরি করেন। এছাড়া ডায়মন্ড হারবারের হাজী বিল্ডিং তৈরি করেছিলেন। দক্ষিণ বারাসাতে তাঁর জমিদারি ছিল। চট্টার মহিষ গোট অঞ্চলে বিরাট বাগান ও জনস্বার্থে মোল্লার হাট শুরু করেন। চট্টার প্রধান সড়ক পথ ডাকঘর হতে মহিষ গোট সংস্কার করে নতুন রূপদান করেন যার নাম হয় সুবিদ আলি রোড। চট্টা সুবিদ আলি বাজারে বড় বড় বাগান পুকুর ঘাট এমনকি খালের ধারে ধারে স্নানের ঘাট নির্মাণ করেছিলেন সাধারণ মানুষের সেবার জন্য। চট্টা বাজার এলাকায় সুবিদ আলি সাহেব তাঁর বহুম আব্বা জাহার আলির নামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডক্টর কোয়ার্টার্স নির্মাণ করেন।

চট্টা সুবিদ আলি ইন্সটিটিউট

সুবিদ আলি সাহেবের তিন স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন স্ত্রী জীবিত অবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন নি। তাঁর সন্তানরা হলেন আব্দুল খালেক মোল্লা, জামসেদ মোল্লা, সেফাত মোল্লা, নজবর রহমান মোল্লা, আতাউর রহমান মোল্লা এবং তিন কন্যা ছিল। মেজ ভাই ইমাম বক্সের তিন পুত্র ছিল হবিবুর রহমান, মতিউর রহমান, রেজাউর রহমান ও চার কন্যা ছিল। অন্যতম ভাই একিন বক্সের দুই পুত্র ছিল আনোয়ার আলি মোল্লা ও সোহবার আলি মোল্লা ও চার কন্যা ছিল।

সেই সময় সুবিদ আলি সাহেবের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর জিয়াউল হক সুবিদ আলি সাহেবের কলকাতার বাড়িতে এসে হাজির হন এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য চান। সঙ্গে সঙ্গে সুবিদ সাহেব দুই ভাইকে বলেন যত টাকা চায় দিয়ে দাও। ভাইস চ্যান্সেলর অবাক হয়ে কত টাকা চাইবেন মুখ উচ্চারণ করতে পারেন না, শেষে সুবিদ সাহেব দশ হাজার টাকা দেন। বর্তমান সময়ে এই টাকার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। জিয়াউল সাহেব এত টাকা আশা করেননি, মোল্লা পরিবারের এই বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে বলেন, জনাব, আপনি আমার বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে আসুন। সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে সুবিদ সাহেব আলিগড়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দেখে চমৎকৃত হন ও মনে মনে স্থির করেন তার নিজ গ্রাম চট্টায় শিক্ষার আলো ফোটাতে আলিগড়ের অনুকরণে একটা হাইস্কুল তৈরি করবেন। ১৯৪২ সালে সুবিদ আলি সাহেব প্রায় তাঁর একক প্রচেষ্টায় চট্টা সুবিদ আলি ইনস্টিটিউট তৈরি করেন। সুবিদ সাহেব তাঁর পুত্র নজিবর রহমান ও ভাইপো হাবিবুর রহমানকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য ভর্তি করেছিলেন। এতে চট্টা গ্রামের মানুষজনের গোঁসা হয়, তারা বলেন আমরা গ্রামের মানুষ পড়বো তাঁর তৈরী চট্টা হাইস্কুলে আর তাদের ছেলেরা পড়বে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হবে না। সুবিদ সাহেব একথা শোনামাত্রই ছেলে ও ভাইপোকে আলিগড় থেকে এনে তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্তি করে দেন। এতে গ্রামের মানুষের আনন্দের সীমা থাকে না।

সুবিদ সাহেবের মানব হৃদয় প্রসারিত ছিল ব্যাপকভাবে। গরীবের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। তার কানে যদি খবর পৌঁছাত তার গ্রামে কেউ অভুক্ত আছে, তার আহারের ব্যবস্থা হয়ে যেত। আর বলতেন, হারে বোকা শুকিয়ে মরেছিস তবু আমায় বলিসনি। আসলে তার সামনে আসার সাহস ছিলনা গ্রামের মানুষদের। এতটাই ভক্তি ছিল সবার। গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থায় তিনি ছিলেন কঠোর ও নিরপেক্ষ। নিজের কাছের লোক আত্মীয় যেই হোক দোষ করলে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। দোষীকে ভৎর্সনা ও বেত্রাঘাত করতেন, পরে আবার দোষীকে ডেকে আপন করে নিয়ে বলতেন, তোকে মেরে আমি দুঃখ পেয়েছি আর অন্যায় করিসনা; তার চিকিৎসারও ব্যবস্থা করে দিতেন। সুবিদ সাহেবের অনুমতি ব্যতীত গ্রামে পুলিশ ঢুকতো না। তিনি নিজে সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষভাবে পুলিশের করণীয় কাজ করে দিতেন।

চট্টা গ্রামের উন্নয়নের জন্য তার প্রচুর পরিমাণে জমির প্রয়োজন হওয়ায় তিনি যাদের কাছে জমি সংগ্রহ করেন বিনিময়ে তাদের জমি কিনে ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। কেউ কোনদিন সুবিদ সাহেবের প্রতি অখুশি হন নি। সমগ্র চট্টা অঞ্চলের মানচিত্রে সুবিদ আলি সাহেবের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত সজীব হয়ে ওঠা ঐতিহাসিক সাক্ষর আজও স্বমহিমায় বিরাজমান।

সুবিদ সাহেবের কলকাতার ম্যাডান স্ট্রীটের বাড়িটি কিছুদিনের জন্য কলকাতা বিখ্যাত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তার স্বর্ণযুগে ১৯৩৪ - ১৯৩৮ সালে মেস হিসাবে ব্যবহার করেছিল। পরপর পাঁচ বার মহামেডানের লিগ জয়ের সাক্ষী ছিলেন সুবিদ সাহেব। তার বাড়ির আনোয়ার, হবি, মতি ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মহামেডান টিমকে উৎসাহ দেবার জন্য সুবিদ সাহেব মাঠেও যেতেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁদের পরিবারের অবদান অক্ষয় কীর্তি আজও সারা জেলার মানুষের মুখে মুখে চর্চার বিষয়।

১৯২৪ সালে চট্টা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চট্টা এম-ই স্কুল। পড়ানো হত ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। ১৯৩৮ সালে তৎকালিন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী নবাব হাবিবুল্লাহ বাহাদুর সাহেবকে সুবিদ সাহেব চট্টা এম ই স্কুলের বার্ষিক উৎসবে নিয়ে আসেন। হাবিবুল্লাহ সাহেব সুবিদ আলীর হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার ভাবনার কথা শুনে সুবিদ সাহেবের দৃঢ়তাকে উৎসাহিত করেন। হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে সঙ্গ দেন সুবিদ সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু তৎকালিন ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর জসিমউদ্দিন সাহেব। ১৯৪০ সালে এম-ই স্কুলের সপ্তম শ্রেণী শুরু করেন। ১৯৪১ সালে চট্টা এম এই স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করার প্রথম প্রয়াস শুরু করেন সুবিদ সাহেব। তার মূল ভিত স্থাপন করেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক। সেই ঐতিহাসিক দিনে সারা গ্রামে উৎসব শুরু হয়ে যায়। অবশ্য অনেক বাধা বিপত্তি টপকাতে হয় তাঁকে ও তাঁর দুই যোগ্য সহোদরকে। ১৯৪২ সালে চট্টা সুবিদ আলি ইনসটিটিউটের কাজ শেষ হলে সুবিদ সাহেব এর দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য নিয়ে আসেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আজিজুল হককে। সুবিদ সাহেব পরে এই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইন্সপেকটর জে. সি. গুহ ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নিজামুদ্দিন সাহেবকে। চট্টার সেই এম-ই স্কুল বর্তমানে আছে প্রাইমারী স্কুল হিসাবে। প্রাইমারির পাশে পুকুরের ধারে ডাক্তার বাড়ি একদা ছিল চট্টার মেয়েদের স্কুল। বর্তমানে সেই স্কুলটি মেয়েদের উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। স্কুলটির বর্তমান নাম চট্টা সুবিদ আলী গার্লস হাইস্কুল। এখনও এই বালিকা বিদ্যালয়টি সুবিদ আলী ইনস্টিটিউটে চলছে। স্কুলের নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছে। নতুন ভবন নির্মানের কাজ শেষ হলে সেখানে স্কুলটি উঠে যাবে। দৌলত পুরের প্রাইমারী স্কুল তৈরিতে সুবিদ সাহেব অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কেবল বিদ্যালয় নয়। বিদ্যালয়ের আশে পাশে প্রচুর সম্পত্তি ক্রয় করে বিদ্যাশিক্ষার প্রসারে সুবিদ সাহেব চট্টা সুবিদ আলি ইনস্টিটিউটের নামে রেকর্ড করে দিয়ে গেছেন। তবে হাইস্কুল স্থাপনের আগেই চট্টার মল্লিক পরিবারের তফজেল মল্লিক, হরজ মল্লিক, হলব্বি মল্লিক, আহমদ জালাল মল্লিক এলাহি কেস মল্লিক তাদের বিদ্যালয় সংলগ্ন দশমিক বিরাশি একর জমি শিক্ষার স্বার্থে সুবিদ সাহেবের হাতে তুলে দেন। সেই জমি বর্তমানে বিদ্যালয়ের সামনে বিরাট ফুটবল খেলার মাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুবিদ সাহেবের আর একটি দৃষ্টিনন্দন বাসনা ছিল যা পূর্ণ হয়নি। তিনি অতিশয় দুঃখিত হয়েছিলেন। সুবিদ সাহেবের প্রবল ইচ্ছা ছিল, হাইস্কুল ও খেলার মাঠটি একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থান করবে সেইমত চারিদিকে দীঘি খননের কাজ শুরু করেছিলেন। তিনদিকে দীঘির কাজ শেষ হয়ে গেলেও কিছু মানুষের প্রবল আপত্তিতে চারিদিকে দীঘির কাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। ফলে অপূর্ব শোভামন্ডিত চিরস্মরণীয় এক কীর্তির সাক্ষী হতে বঞ্চিত থেকে গেলাম চট্টা এলাকার জনগণ।

চট্টা হাইস্কুল, খেলার মাঠ আগের থেকে অনেক অনেক দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। কেবল হারিয়ে যাচ্ছে ভাল পড়ুয়া আর ভাল খেলোয়াড়। তবে ভ্রমন পিপাসুদের এই স্কুল মাঠও দিঘির সৌন্দর্য মন কাড়বেই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমগ্র চট্টা অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজকর্ম (পঞ্চায়েত ভবন) সুচারু হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে সুবিদ সাহেবের দেওয়া বাজারের ভবন হতেই। সুবিদ সাহেব নিজ হাতে প্রায় একক প্রচেষ্টায় পুরো গ্রামটাকে সাজিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে অনেক কিছু নব কলেবরে উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে আছে। আবার অনেক কিছুই শুধুই অতীত ধ্বংসের লীলায় অকাল মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে।

১৯৬৭ সালে সুবিদ আলি ইনস্টিটিউটের হেড পণ্ডিত শ্রী প্রভেন্দু কুমার শর্মা সুবিদ আলি স্মরণে মন্তব্য করেছিলেন 'আমাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতেও আবির্ভাব হইয়াছিলেন এক মহামানবের জ্যোতির, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' এই জ্যোতির আলোকে বিদূরিত হইয়াছিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার, আবির্ভূত হইলেন আলহাজ সুবিদ আলি মোল্লা সাহেব। একবার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তিন মাসের বেতন বাকি পড়েছিল, সেই সংবাদ সুবিদ সাহেব অসুস্থ অবস্থায় শুনে আর্তনাদ করে বলেছিলেন যে আমার জীবিতকালেই যদি আমার স্কুলের শিক্ষকরা মাহিনা না পায় আমার মৃত্যুর পর না জানি কি হবে! শিক্ষক এম সোহরাব আলি মন্তব্য করেছিলেন - মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রাজর্ষি অশোকের প্রাণে যেমন উৎসার করে দিয়েছিল সর্বজীবে করুণার প্রস্রবন ধারা; হয়তো কোন বেদনার আঘাতে সুবিদ সাহেবের প্রাণে তেমনি জাগিয়েছিল জনকল্যাণের পূর্ব চেতনা. এই অঞ্চলের সমস্ত জনহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান সুবিদ আলি মোল্লা সাহেবের বলিষ্ঠ হাতে সম্পন্ন হয়েছিল।

বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সেখ এনসাফ আলি মন্তব্য করেছিলেন 'শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া এই সমাজের দুর্গতির কথা চিন্তাভাবনা করে যে মহাপ্রাণ, দেশবন্ধু ও শিক্ষাদরদী জ্ঞানের মশাল জ্বালার উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ নিলেন তিনি হলেন তদানীন্তন খ্যাতনামা ধনী ব্যবসায়ী মরহুম আলহাজ খান সাহেব সুবিদ আলি মোল্লা, সত্যই যে মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে তিনি ধরায় এসেছিলেন মরণে তা তিনি দান করে গেলেন দেশবাসীকে। যে ক্ষুদ্র বীজ সুবিদ আলি মোল্লা চট্টার অনুর্বর জমিতে পুঁতেছিলেন তা আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আমি এই মহাপুরুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করেছি। জ্ঞান সাধনায়, ক্ষমায়, ন্যায় বিচারে বদান্যতায়, সমাজসেবায়, শ্রমের মর্যাদাদানে স্বাবলম্বনে ও চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন সকলের আদর্শ।

সুবিদ আলি সাহেব তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে যে দেবজ্ঞানে সেবা করতেন প্রাণাধিক ভালবাসতেন সে সম্পর্কে হেড পণ্ডিত প্রভেন্দু বাবু আরো বলেছেন যে, একবার সুবিদ আলি সাহেব লক্ষ্য করলেন বিদ্যালয়ের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন 'ওহে আমার বুকে আঘাত করিয়াছ'।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল আজ উচ্চমাধ্যমিক স্বীকৃত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ধারণ করেছে। প্রথম অবস্থায় সুবিদ আলি সাহেব শিক্ষার যাবতীয় ভার অর্পণ করেন-শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মরহুম আব্দুল আজীমকে, পরে আলহাজ জিয়াদ সাহেব ও বর্তমানে সেখ এমদাদ আলি এই মহান দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক মন্ডলী - সম্পাদক - সারফুদ্দিন মল্লিক - সভাপতি খলিলুর রহমান মুফতি, সুনীল ঘোষ, মেহেদী হাসান, মহব্বত গাজী, আতিবার মল্লিক, মতিউর রহমান, শান্তিরাম ঘোষ, আনসার আলি, ফজল মাহমুদ ও শেখ এমদাদ আলি।

৪ঠা জানুয়ারী ১৯৫৫ সালে সুবিদ আলি মোল্লা পরপারে পাড়ি দেন।

'জ্ঞানাজ্ঞান শলাকায় ঘুচায়েছে অজ্ঞান তাপস'

বর্তমান বংশধর :

সুবিদ আলীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র বর্তমানে জীবিত। জামশেদ আলী এবং নজিবর রহমান। সুবিদ আলীর পুত্রগণ সবাই যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। সবার এখনও কলকাতায় ব্যবসা আছে। পুত্রগণ বিভিন্ন সময় পিতার তৈরী স্কুলে সেক্রেটারীর পদ অলংকৃত করেছেন। নজিবর রহমান সাহেব গার্লস স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন গত বছর ২০০২ সাল পর্যন্ত।